যায়যায়দিন

তারিখ ..21 MAR 2008..
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

অভ্যন্তরীণ নৈরাজ্যে ডুবতে বসেছে ঢাকার শেখ বোরহানুদ্দীন কলেজ

যাযাদি রিপোর্ট

মামলা, গণছাটাই, বেতন কাটা, কারণ দর্শাও, হুমকি, গালমন্দ, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে নোংরা পোস্টারিং এবং ব্যক্তি নির্ভর প্রশাসনের ব্যর্থতায় নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে ঢাকার অন্যতম বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শেখ বোরহানুদ্দীন কলেজে।

অভিযোগ রয়েছে, অ্যাকটিং প্রিন্সিপাল বেগম কামরুন্নাহার আহমেদ কলেজের 'এমপিও সারেন্ডার' নিয়ে সৃষ্ট বিরোধে আইনি লড়াইয়ে পিছু হটতে বাধ্য হওয়ায় এর প্রতিশোধ নিচ্ছেন শিক্ষক-কর্মচারীদের ওপর। তার দৌরাত্ম্যে কলেজের শিক্ষা কার্যক্রমেও ধস নেমেছে।

ঢাকা ইউনিভার্সিটির সীমানা লাগোয়া নাজিমউদ্দীন রোডে এ কলেজটির অবস্থান। এখানে উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক শ্রেণীসহ ১৩টি বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু রয়েছে।

এমপিও সারেন্ডার ইসুতে গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে শেখ বোরহানুদ্দীন কলেজের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। বেগম কামরুন্নাহার আহমেদ অ্যাকটিং প্রিন্সিপাল হলেও বিএ পাস কোর্সে তৃতীয় বিভাগ থাকায় আইনগত জটিলতায় প্রিন্সিপাল হতে পারেননি। এ পরিস্থিতিতে কলেজের সব শিক্ষক-কর্মচারীর এমপিও সারেন্ডার করে নিজে প্রিন্সিপাল পদটি নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এমপিওভুক্ত ১৪ শিক্ষক-কর্মচারী হাই কোর্টে রিট করায় তার এ পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।

ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে সাময়িক বরখাস্ত হয়েছেন তিন শিক্ষক। বরখাস্তের এ প্রক্রিয়া শুরু হয় সিনিয়র আরো চার শিক্ষকের বিরুদ্ধে। জানা গেছে, আরো ১৩ শিক্ষক-কর্মচারী রয়েছেন চূড়ান্ত ছাটাই তালিকায়। সূত্র মতে, এমপিও সারেন্ডারের সিদ্ধান্ত নিয়েও আইনি লড়াইয়ে পিছু হটতে বাধ্য হওয়ায় কয়েক ধাপে কমপক্ষে ২০ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলেজ প্রশাসন। আবার সাময়িক বরখাস্ত হওয়া এ তিন শিক্ষকের বিরুদ্ধে নিজে বাদী হয়ে মামলা করেছেন অ্যাকটিং প্রিন্সিপাল। অভিযোগ এনেছেন, বরখাস্ত আদেশ পাওয়ার পর ৯ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টায় ওই তিন শিক্ষক তাকে প্রাণনাশের হুমকি দেন।

তবে অভিযুক্ত শিক্ষকরা দাবি করেন, ৭ ফেব্রুয়ারির পর এক দিনও অ্যাকটিং প্রিন্সিপালের সঙ্গে তাদের দেখা হয়নি। অভিযোগ রয়েছে, পাচ বছর আগে তৎকালীন কলেজ পরিচালনা পরিষদকে নিজের পছন্দ মতো সাজিয়ে সাবেক প্রিন্সিপাল কাজী ফারুক আহমেদকে বরখাস্ত করে অ্যাকটিং প্রিন্সিপাল হন শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা তালিকায় ২৩ নাম্বার ক্রমধারী বেগম কামরুন্নাহার আহমেদ।

জানা গেছে, এ কলেজের বাণিজ্য অনুষদের বিভাগগুলো গত বছর পর্যন্ত শিক্ষার্থী ধরে রাখতে সক্ষম হলেও এবারের চিত্র হতাশাজনক। কমপিউটার সায়েন্সে চলছে শনির দশা। পরিবেশ বিজ্ঞান, বাংলা, ইসলামের ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ শিক্ষার্থীর অভাবে মৃতপ্রায়। স্নাতক শ্রেণীতে কাগজ-কলমে ২০ থেকে ২২ জন করে শিক্ষার্থী ভর্তি হলেও ক্লাসে উপস্থিত থাকে মাত্র দুই থেকে তিনজন। কখনো শিক্ষার্থীর দেখাই মেলে না। এ কারণে ক্লাসরুমে শিক্ষকদের উপস্থিতিও অনিয়মিত।

আইবিএমের (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) এক শিক্ষার্থী অভিযোগ করেন, কমপিউটার ফি বাবদ তাদের কাছ থেকে আদায় করা হয় চার হাজার টাকা। অথচ সব কয়টি কমপিউটার নষ্ট হয়ে পড়ে রয়েছে এক বছর ধরে। একই অভিযোগ উচ্চ মাধ্যমিক ও বাণিজ্য অনুষদের শিক্ষার্থীদেরও। তাদের কাছ থেকে এ খাতে আদায় করা হয় বার্ষিক দুই হাজার টাকা করে।

বিস্ময়কর হলো, উচ্চ মাধ্যমিক 'এ' শাখার রুটিনে ল্যাব ক্লাসই অন্তর্ভুক্ত নেই। কমপিউটার সায়েন্সের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ইন্টারনেট খাতে ফি আদায় করা হলেও সে সুবিধা দুর্লভ। প্রতি বছর উচ্চ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে ৪০০ টাকা করে কোচিং ফি আদায় করা হয়। পুওর ফান্ডের নামে টাকা আদায় করা হয় প্রতি বছর। কিন্তু গত পাচ বছরে একজন দরিদ্র শিক্ষার্থীকেও এ খাত থেকে বৃত্তি দেয়া হয়নি। চলতি অর্থ বছরই বাণিজ্য অনুষদের শিক্ষার্থীদের ভর্তি ফি ৮০০ টাকা এবং বেতন ২০০ টাকা বেড়েছে।

শিক্ষকরাও আর্থিক অনিয়মের শিকার হচ্ছেন। অভ্যন্তরীণ ও পাবলিক পরীক্ষা খাতে প্রাপ্য অর্থের একটি বড় অংশ ভাগ-বাটোয়ারা হয় অ্যাকটিং প্রিন্সিপাল এবং তার একান্ত বাধ্য শিক্ষকদের নিয়ে গঠিত পরীক্ষা কমিটির সদস্যদের মধ্যে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক জানান, ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষার কেন্দ্রও এ কলেজ হয়। 'গ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা নভেম্বরে এ কলেজ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউনিভার্সিটি থেকে পাঠানো চিঠিতে পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব পালনকারী শিক্ষকদের সম্মানীও পাঠানো হয়েছিল ৮০০ টাকা হারে। কিন্তু শিক্ষকরা পেয়েছেন ৫৭০ টাকা করে।

জানা গেছে, কর্মচারীদের সাময়িক বরখাস্ত করার একক এখতিয়ার ন্যস্ত করা হয়েছে অ্যাকটিং প্রিন্সিপালের হাতে। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী শফিকুল ইসলাম ইউনুস, নূরজাহান এবং সাহেরা প্রতিদিন যথারীতি কলেজে এসে দায়িত্ব পালন করলেও ২৪ জানুয়ারি থেকে হাজিরা খাতায় তাদের স্বাক্ষর করতে দেয়া হচ্ছে না। জানুয়ারি মাসের অর্ধেক বেতন দেয়া হলেও ফেব্রুয়ারি থেকে তাও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক জুনিয়র শিক্ষক জানান, অ্যাকটিং প্রিন্সিপালের বিরাগভাজন হয়ে এ কলেজে চাকরি করা সম্ভব নয়। এ অবস্থায় অ্যাকটিং প্রিন্সিপালের নির্দেশে ঝুঁকি আছে জেনেও চাকরি রক্ষার জন্য 'মিথ্যা মামলার' এজাহারে স্বাক্ষর করতে হয়েছে তাদের। মিথ্যা সাক্ষ্যও দিতে হয়। শিক্ষক হয়েও শিক্ষকের বিরুদ্ধে নোংরা পোস্টার লাগাতে হয়। সিনিয়র এক শিক্ষিকা বলেন, এ বয়সে আর চাকরির ভয় করি না। ভয় তার মুখ এবং নোংরামি নিয়ে। তার সিদ্ধান্তের বিপক্ষে গেলেই তিনি যে ভাষায় গালাগাল এবং কুৎসা রটান, তা বস্তি সংস্কৃতিকেও হার মানাবে।

এ বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল তার বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ অস্বীকার করেন। তিনি টেলিফোনে জানান, কাউকে বহিষ্কার করা আমার একার এখতিয়ারে নেই। এটা ম্যানেজিং কমিটি দেখে। তার বিরুদ্ধে যে কোনো অভিযোগ সরকার তদন্ত করে দেখতে পারে বলেও তিনি জানান।